e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ৬ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | অক্টোবর ২০১৫

জানা অজানা

ছাতার মাথা মাথায় ছাতা

এখন অক্টোবর মাস। বৃষ্টির দিনগুলি শেষ হয়ে আসছে। এখন অলোয় ভোরবে শরতের আকাশ। তারই মাঝে মেঘ জমবে কোথাও। দু-চার পশলা বৃষ্টি হবে থেকে থেকে। তবে ছাতার আর প্রয়োজন হবে না তেমন। আবার চৈত্রের চাঁদি-ফাটান রোদের হাত থেকে বাঁচতে তাদের ডাক পড়বে কিছুদিন পরে। গ্রীষ্ম-বর্ষায় ছাতা আমাদের অনেক দিনের সঙ্গী। কত দিনের? তা প্রায় চার হাজার বছর তো হবেই। কারণ, সেই তত দিন আগেই চিন দেশে আবির্ভাব হয়েছিল আজকের ছাতার পূর্বপুরুষের। তাই বলা যেতে পারে ছাতা চিনেদের আবিষ্কার। অনেক কিছুর মত, মানুষের সভ্যতায় এটি তাদের আরও একটি অবদান।

শুরুতে কেবল রোদ থেকে বাঁচতেই ছাতা ব্যবহার হত সে দেশে। উপায় ছিল না। সেই প্রাচীন ছাতায় রোদ আটকান গেলেও, বৃষ্টির জল আটকাত না। কিন্তু উপায় একটা বেরল শেষমেশ। ভেবেচিন্তে চিনে ছাতা নির্মাতারা ছত্রিতে মোম আর লাক্ষার প্রলেপ দিয়ে দেখলেন কী হয়। যা ভাবা হয়েছিল হল ঠিক তাই – মোম আর লাক্ষার আস্তরণ ভেদ করতে পারল না বৃষ্টি। সেই থেকে রোদে-জলে ছাতা আছে আমাদের সঙ্গে।

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

কচি, বুড়ো সকলের প্রিয় ডিপ্পি

সকাল থেকেই লম্বা লাইন পড়ে তাকে দেখতে, তার সঙ্গে সেলফি তোলে অনেকে

তাকে ঘিরে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। তাকে দেখার জন্য বাবা মায়ের হাত ধরে, কোলে চড়ে এমনকী প্যারাম্বুলেটরে বসেও কচি কাঁচারা এবং হুইলচেয়ারে প্রবীণরা পর্যন্ত সেই ভিড়ে সামিল। গত ১২ অগস্ট আমরাও সেই ভিড় ঠেলে একটু একটু করে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম বটে, তবে তেমন সফল হচ্ছিলাম না। আসলে তাকে সঙ্গে নিয়ে কেউ তখন তুলছে সেলফি বা নিজস্বি ছবি। কেউ বা আমারই মতো ঘাড় ঘুরিয়ে অপার বিস্ময়ে তার মাথা থেকে লেজ অবধি যেন মেপে দেখার চেষ্টা করছিল। আর যাকে নিয়ে এত হই চই, যাকে আদর করে ডাকা হয় 'ডিপ্পি'- সে নিজের বিশালত্ব নিয়েও কেমন যেন নির্বিকার। ডাইনোসর আকারে বড় জানতাম। কিন্তু এতো বিশাল!

বস্তুতই লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের সেন্ট্রাল হলে ঢুকে তাকে দেখে আমারও চোখ ছানাবড়া হওয়ারই জোগাড় হয়েছিল। এই ভেবে শিহরণ জাগছিল যে, আমাদের এই নীলগ্রহের বুকেই একদা সে দাপিয়ে বেড়াতো। মনে হল যাকে নিয়ে এতো হুড়োহুড়ি দেখছি সে যদি জানত, যে ভবিষ্যতে তার এতোটাই কদর হবে তাহলে বোধহয় সে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার চেষ্টা করত। কিন্তু তা আর হওয়ার নয়। এই ডিপ্পি তথা ডিপ্লোডকাস তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই কোটি কোটি বছর আগেই। এবং এই মিউজিয়ামে তার কোনও অবয়ব নেই, আছে শুধু তার কঙ্কাল। তাও আবার আসল নয়, ঢালাই করা নকল। তা হোক, তবু তার আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তায় সে হয়ে উঠেছে একেবারে স্টার বা নক্ষত্র।

কিন্তু কে এই ডিপ্পি? কোথা থেকেই বা তার আগমন? ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, লাইভসায়েন্স.কম ও উইকিপিডিয়া থেকে জানতে পারছি বেঞ্জামিন মুজ ও স্যামুয়েল উইলিস্টন প্রথম ডিপ্লোডকাস ডায়নোসর, তথা ডিপ্পির কঙ্কালের জীবাশ্ম উদ্ধার করেন ১৮৭৭ সালে কলোরাডোর ক্যানন সিটি থেকে। জুরাসিক যুগ যখন শেষ হয়ে আসছে - সেই পনের সাড়ে পনের কোটি বছর আগে বিশালাকৃতি ডায়নোসরদের মধ্যে অন্যতম এই ডিপ্লোডকাসরা উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় ঘুরে বেড়াত।

এবার ২ পাতায়

তুঙ্গভদ্রার ভোঁদড়

তুঙ্গভদ্রা নদীর ৩৪ কিমি প্রবাহপথ এখন ভোঁদড়দের অভয়নিবাস হিসেবে চিহ্নিত হল। সেখানে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। ভোঁদড়দেরর রক্ষা করতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্ণাটক সরকার। এ ধরনের সংরক্ষণ ক্ষেত্র ভারতে প্রথম। তুঙ্গভদ্রা

নদীতে ভোঁদড় এখনও আছে, কিন্তু শিকার আর জলদূষণের কারণে তারা ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়ছে। মনে করা হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত তাদের রক্ষা করবে।

বিপন্ন পান্না

জুড়ে দেওয়া হবে দুই নদী – কেন আর বেতওয়া। কেন নদীর বাড়তি জল ঢুকবে বেতওয়াতে, আর জল সঙ্কটে মেটাবে বেতওয়ার চারপাশের এলাকার। কিন্তু বাঘের আস্তানা পান্না অভয়ারণ্যের প্রায় ১০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এর ফলে। তাই ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া বলেছে পান্নার সঙ্গে আরও চার অভয়ারণ্য জুড়ে দেওয়া উচিৎ।

প্রোটেক্টেড এরিয়া আপডেট

বিশাল লম্বা গলা, তেমনই বিশাল লেজ

১ পাতা থেকে

অদ্ভূৎ ছিল তাদের দেহের গঠন। এক দিকে বিশাল লম্বা গলার প্রান্তে ছোট্ট মাথা, আর এক দিকে চাবুকের মতো দীর্ঘকায় লেজ। চার পায়ের ওপর দাঁড়াতে যেন দুদিক থেকে তাকে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করত।

এই ডিপ্লোডকাসদের চারটি প্রজাতির কথা জানা যায়। এই ডিপ্লির থেকে বড় ডায়নোসরও হয়তো ছিল। কিন্তু এতো বিপুল আকৃতির ডায়নোসরের গোটা একটা কঙ্কাল উদ্ধার হয় নি। সেই সময় এই আবিষ্কার এতোটাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যে, পরে পিটসবার্গের কার্নেজি মিউজিয়াম থেকে ডিপ্লির কঙ্কালের নকল পৃথিবীর নানা দেশের মিউজিয়ামই সংগ্রহ করে।

শুধু কি তাই ডিপ্লিকে নিয়ে গবেষণারও যেন শেষ নেই। সে দেখতে কেমন ছিল, কেমন ছিল তার জীবনযাত্রা। সে জলচর না স্থলচর ছিল, না কি উভচর। এবং তার ওই দীর্ঘ গলার শেষে চোখ, মুখ নাক নিয়ে যে ছোট্ট মাথা, সেখান থেকে ডিপ্লি অক্সিজেনই বা কী ভাবে ওই বিশাল দেহের লেজ পর্যন্ত চালান করত - এই সব নিয়ে গবেষকদের নানা মত।

কঙ্কাল দেখেই অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম কী বিশালই না ছিল তাদের আকৃতি। মনে করা হয়, নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা অবধি তারা প্রায় ১১৫ ফিট পর্যন্ত লম্বা হত। উচ্চতায় ১৬ ফিটের মতন। আর ওজন হত ১০-১৫ টন। মাথাটি ছোট্ট বলে মস্তিষ্কের আয়তনও ছিল ছোট্ট। তাই তারা বুদ্ধিতেও ছিল খাটো। দাঁত ছিল তাদের অনেকটা চিরুনির দাঁড়ার মতো। তৃণভোজি এই প্রাণীদের খাদ্য বলতে ছিল গাছের বা ঝোপঝাড়ের কচি লতাপাতা ঘাস, ফার্ণ ইত্যাদি। কিন্তু ডিপ্লিদের গলা এতো লম্বা ছিল কেন? মনে করা হয়, গলা বাড়িয়ে যাতে অনেক উঁচু গাছ থেকে সে পাতা ছিঁড়ে খেতে পারে আবার তার পায়ের কাছাকাছি ঘাস, লতাপাতা কিম্বা জল খেতেও তার যাতে অসুবিধে না হয় সেই জন্যই প্রকৃতি যেন তাকে অমন উপযোগী করেছিল। তবে ডিপ্লি -র সমসাময়িক অন্য প্রজাতির ডায়নোসররাও ঘুরে বেড়াত।

ন্যাচারল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে পরে আরও অনেক ডায়নোসরদের কঙ্কাল, মডেল দেখলাম। কিন্তু মনের মধ্যে যেন রয়ে গেল সেই ডিপ্লিই। ওই মিউজিয়ামে হাজার হাজার কৌতূহলী চোখের সামনে গোটা হল জুড়ে ডিপ্লির ওই অত্যাশ্চর্য উপস্থিতি যেন কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর ওই বাসিন্দাদের মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিলাম। কে জানে হয়তো দল বেঁধে ওই ধীর গতি দৈত্যাকার ডিপ্লিরা খাবারের সন্ধানে ঘুরত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। কে জানে হয়তো খাদ্যের অভাব ঘটতে থাকায় সেই সময়ে অন্যদের সঙ্গে টিকে থাকার লড়াইয়ে কেবলই তারা হেরে যাচ্ছিল। কে জানে হয়তো এই ভাবেই ডিপ্লিরা ধীরে ধীরে একদিন পৃথিবীর বুক থেকে চিরকালের মত হারিয়ে গেল।

মালবী গুপ্ত

কাঁঠালের আটা, এমনকী সরবৎও তৈরি হচ্ছে

কথায় বলে ‘গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল’। আসলে কাঁঠালের আঠার হাত থেকে বাঁচতে তা কাটতে বা ছাড়াতে গেলে তেল হাতে লাগাতেই হয়। কিন্তু কাঁঠাল তৈরি হতে যে অনেক সময় লাগে তাই অধৈর্য হলে চলে না। তবে গাছে কাঁঠাল ফলা মানে এমনই সুসময়ের শুরু যে নাকে তেল দিয়েও বোধহয় দিব্বি নিদ্রা যাওয়া যায়। খাবারের চিন্তায় ব্যস্ত হতে হয় না আর। ‘ডাউন টু আর্থ’ পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলছে বর্ষার দিনগুলিতে যখন গ্রামে গ্রামে ধানের মজুত ভান্ডার তলানিতে এসে ঠেকে, অথচ গোলায় নতুন ধান উঠতে তখনও বাকি থাকে বেশ কিছু দিন, তখন কাঁঠাল গাছ তার বিপুল ফলন দিয়ে খাবারের চাহিদা মেটাতে পারে অনেকটাই।

আমাদের দেশে গাছে-ফলা ফলের মধ্যে কাঁঠালই হল সবচেয়ে বড়। আর তা এমন বিপুল সংখ্যায় ফলে যে তা খেয়ে শেষ করা যায় না। জানা যাচ্ছে যে ভারতে যত কাঁঠাল ফলে তার ৫০ শতাংশই নষ্ট হয়। অথচ তা যদি নানা ভাবে সংরক্ষণ করা যেত তাহলে আমদের খাদ্যভান্ডার আরও পরিপূর্ণ হত। আর সে কথাই দেশবাসিকে বোঝানর চেষ্টা করে চলেছেন কেরলের এক চাষি।

রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৫ বছর ধরে জেমস ম্যাথিউ কাঁঠালকে নানা ভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে চলেছেন। এখন চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেছে কিন্তু জেমস-এর অধ্যবসায়ে কোনও ছেদ পড়ে নি। কাঁঠাল দিয়ে কী না তৈরি করেছেন জেমস। কাঁঠালের কোয়া শুকিয়ে তা মজুত করার ব্যবস্থা, কাঁঠালের বিচি গুঁড়ো করে আটা, কাঁঠাল দিয়ে সুস্বাদু পানীয়, এমনকী শিশুদের খাবারও। ইতি মধ্যেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তাঁর খরচ হয়ে গেছে ১০ লক্ষ টাকা। অথচ ব্যবসা করে সে টাকা তুলে নেওয়ার কোনও চেষ্টা করেন নি জেমস। বরং জনে জনে বিলিয়েছেন তাঁর চর্চার ফসল, যাতে সচেতন হন মানুষজন। মার্চ মাস থেকে জুলাই পর্যন্ত এক একটা গাছে ৫০-১০০ কাঁঠাল হয়। আর একটা কাঁঠালের ওজন হয় ১০-১৫ কেজি। “কত খাবে মানুষ?” প্রশ্ন করেছেন জেমস নিজেই। তাই কাঁঠাল যাতে নানা উপায়ে সারা বছর ধরে খাওয়া যায় তার জন্যই তো জেমস-এর এতো চেষ্টা।

এক কৃষি বিশেষজ্ঞ কাঁঠালকে বিস্ময় গাছ বলে বর্ণনা করেছেন। এ গাছ লাগান যায় সহজেই। রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় কম। এবং তা আবহওয়া পরিবর্তনের প্রভাব সামলে নিতে পারে। সারা বিশ্বজুড়ে আবহওয়া পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে যখন নতুন নতুন খাদ্যের খোঁজ চলেছে তখন কাঁঠালের মত খাবারকে উপেক্ষা করা উচিৎ নয় বলেই তিনি মনে করেন।

কাঁঠাল এল কোথা থেকে? রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ঘন সবুজ বর্ষারণ্য থেকে। সেখান থেকেই সে এক সময়, কোনও এক সুদূর অতীতে, মানুষের কাছে এসেছিল।

হারকিউলিস বিট্‌ল

নামেই বোঝা যাচ্ছে, সে পালোয়ান গুবরে। কারণ সে তার নিজের শরীরের ওজনের তুলনায় ৮৫০ গুণ বেশি ওজন না কি বহন করতে পারে। তাই তাকে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী প্রাণী বলে মনে করা হয়। গুবরেদের সমাজে সে অন্যতম বৃহৎ প্রজাতি বলেও খ্যাত। এই প্রজাতির কিছু কিছু পুরুষ গুবরে তো ৭ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। পুরুষদের মাথার সামনে বিশাল শিঙের মতো একটি শুঁড় থাকে যা কখনও কখনও তাদের দেহের থেকেও দীর্ঘ। এবং যাকে তারা কাজে লাগায় অন্য পুরুষ গুবরেদের সঙ্গে বিবাদের সময়। মূলত দক্ষিণ আমেরিকার বর্ষারণ্যের এই বাসিন্দার খাদ্য পচা কাঠ, লতাপাতার দেহাংশ এবং ছোটখাটো পোকামাকড়। তবে সেও আবার সাপ, ইঁদুর, বাদুড়, পাখি ইত্যাদিদের খাদ্য।

‘এল-নিনো’,‘লা-নিনা’র দাপট ক্রমেই বাড়বে

‘এল-নিনো’ আর ‘লা-নিনা’ – এদের নাম আমরা মাঝে মাঝেই শুনতে পাই। দুটি নামই এসেছে স্প্যানিশ ভাষা থেকে। এল-নিনো মানে ছোট্ট ছেলে, আর লা-নিনা-র অর্থ ছোট্ট মেয়ে। ছোট হলে কী হবে, এদের ক্ষমতা অসীম। বিশেষ করে আবহাওয়া যখন বেঁকে বসে বা বৃষ্টি যখন বেপাত্তা হয় তখন বলা হয় এ সব এল-নিনো বা লা-নিনার কারসাজি। এগুলি আসলে দু ধরনের বিশেষ সামুদ্রিক পরিস্থিতি যা প্রশান্ত মহাসাগরে লক্ষ করা যায়। কখনও কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের জল কিঞ্চিৎ গরম হয়ে ওঠে। তখন বলা হয় এল-নিনো কলকাঠি নাড়ছে। আবার অন্য দিকে ওই মহাসাগরের জলই আবার থেকে থেকে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন আমরা বলি লা-নিনা মহাসাগরকে বশ করেছে। সমুদ্রের জলের তাপের ওপর নির্ভর করে বাতাসের চালচলন। তা বাড়লে বা কমলে বদলে যায় হাওয়ার গতিবিধি। তাই, কখনও কখনও দেখা যায় মৌসুমী বায়ু চলতে চলতে থমকে যায়, গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি করে। নিজের চেনা আকাশপথ ছেড়ে

দিগভ্রান্ত হয়ে চলে যায় অন্য কোথাও। আর তখন অনাবৃষ্টি দেখা দেয় দেশে দেশে। তবে জানা যাচ্ছে যে এই দুই শিশু দিন দিন আরও দামাল হয়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুরন্তপনা বাড়ছে বই কমছে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন তাদের শাসন করার কোনও উপায় নেই। তাই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘোর গোলযোগের সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে। বলা হচ্ছে এল-নিনো আর লা-নিনার দৌলতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপোকূল জুড়ে ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা আরও ঘন ঘন ঘটবে। আর সেই সঙ্গে বিধ্বস্ত সমুদ্রকুল জুড়ে দেখা দেবে ভাঙ্গন ও ধস। বাস্তুহারা হবেন বহু মানুষ। বিশ্বের ১৩ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের যৌথ গবেষণায় ভবিষ্যতের এমনই এক ছবি ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন সেই দুর্দিনের জন্য এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিৎ।

সূত্রঃ ইউরেকাঅ্যালার্ট.কম

হলুদ ওষুধের মতো কাজ করে মানুষের শরীরে

জেনে রাখা ভাল

ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি প্রায় সব রান্নায় যে মশলার ব্যবহার না হলেই নয়, সে হল হলুদ। শুধু রঙেই নয়, খাদ্য গুণেও সে বোধহয় সব মশলাকে হারিয়ে দিতে পারে। জানা গেছে যে -

- দক্ষিণ ভারত ও ইন্দোনেশিয়াই হলুদের আঁতুড় ঘর। প্রায় ৫০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে হলুদের চাষ হচ্ছে।
- হলুদের শতকরা ৯০ ভাগই চাষ হয় ভারতে। প্রায় ৩০ প্রজাতির হলুদ আছে।
- হলুদের প্রধান উপাদান কারকামিন'র নানা ওষধি গুণ আছে। এবং ভারতে হাজার হাজার বছর ধরেই সনাতনি তথা আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় হলুদের ব্যবহার প্রচলিত।
- ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীরা ইউরোপে হলুদের ব্যবহার চালু করলেও ইদানীং তা জনপ্রিয় হয়েছে, মূলত তার নানা ওষধি গুণাগুণ আবিষ্কারের পর।

- সাম্প্রতিক নানা গবেষণা রিপোর্ট বলছে যে, ব্যথা যন্ত্রণা প্রশমন ও নানাবিধ রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি, ক্যানসার কোষের বৃদ্ধির গতিও কমিয়ে দিচ্ছে ওই কারকামিন। যা এই রোগ প্রতিহত করায় খুবই সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।
- ত্বক বা রূপ চর্চায় হলুদের ব্যবহার তো সেই স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে।
- আমাদের দেশে নানা মাঙ্গলিক কাজে এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে (গায়ে হলুদ) হলুদের ব্যবহার বহু প্রাচীন।
- নিত্যকার রান্না ছাড়াও আইসক্রিম, দই, কেক, মিষ্টি, বিস্কিট, নানা সস, প্রসাধনদ্রব্য, ওষুধ ইত্যাদিতে ব্যবহার হয় হলুদ।

সূত্রঃ ডবলিউএইচফুডস.কম, টারমারিক.কো.ইন

এখন রিকশা চলে লন্ডন,প্যারিসের রাস্তায়

পৃথিবীর অন্যতম সুসজ্জিত, শৌখিন আর কৃষ্টির আধার বলে খ্যাত দুই শহর লন্ডন আর প্যারিস। এই দুই শহর এমন একটি যানবাহনের প্রচলন ঘটিয়েছে যা সেখানে কোনও দিন ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশে আছে বহু কাল। বাহনটি হল আমাদের অতি সুপরিচিত সাইকেল-রিকশা। লন্ডন আর প্যারিসের চকচকে ঝলমলে রাস্তায় এখন সাইকেল-রিকশা হামেসাই দেখা যায়। ইংলন্ডের লন্ডন শহরে সেগুলি বেশি চলে সেই সব এলাকায় যেখানে পর্যটকদের আনাগোনা বেশি। প্যারিসে দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে সারি বেঁধে সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে থাকতে তো দেখা যায়ই, এমনকী শহরের অন্যত্রও তাদের অনায়াস যাওয়া আসা এখন।

চলার পথে দেখা

তবে আমাদের রাস্তায় যে সাইকেল-রিকশা চলে তার থেকে ওখানকার রিকশাগুলি অনেকটাই উন্নত। সেগুলি দেখতে সুন্দর, সিটগুলি আরামদায়ক, রোদ-বৃষ্টি যাতে না লাগে তাই মাথার ওপর ফাইবারগ্লাসের লম্বা ছাদ, সামনে সাদা বৈদ্যুতিন আলো, পেছনেও ছোট ছোট লাল বাতি। ঝোলান থাকে ভাড়ার চার্ট। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সেগুলিতে আছে গিয়ার। তাই রাস্তা উঁচুনিচু যেমনই হোক না কেন, চালককে বিশেষ কসরত করতে হয় না। প্যাডেলে হাল্কা চাপ দিলেই তিন-চাকার রিকশা তরতরিয়ে চলতে থাকে। তাদের গতিও নেহাৎ খারাপ নয়। তাই বড় রাস্তায়, বাস আর গাড়ির পাশাপাশি তাদেরও চলার অনুমতি মিলেছে।

এমনই এক রিকশায় সওয়ার হওয়ার সুযোগ হয়েছিল

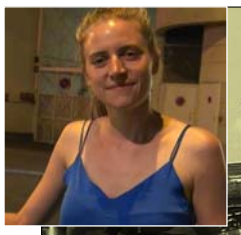

প্যারিসে। রাত তখন দশটা। সারাদিন ঘুরে বেড়ান আর অবিরাম হাঁটার পরে আমার আর পৃথিবীর ডায়েরি'র সম্পাদক দুজনেই বেশ ক্লান্ত। রাতের আলোকোজ্জ্বল আইফেল টাওয়ার থেকে আমাদের হোটেল প্রায় আধঘন্টার হাঁটা পথ। কিন্তু আমাদের পা'গুলি তখন আর হাঁটতে রাজি নয়। তাই চোখ পড়ল দাঁড়িয়ে থাকা রিকশার দিকে। গন্তব্য বোঝান গেল। ভাড়া নিয়ে রফা হল। দুজনেই চড়ে বসলাম প্যারিসের রিকশায়। চালক এক ফরাসি যুবতী (**ওপরে ছবি**)। পড়াশোনার ফাঁকে কিছুদিন রিকশাা চালিয়ে একটু উপার্জন করে নিচ্ছেন। স্বচ্ছন্দে প্যাডেল ঘোরাচ্ছেন, আর বলে চলেছেন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা, তাঁর পছন্দ অপছন্দ আর ইংরেজি ভাষায় সড়গড় হয়ে ওঠার আকাঙ্খার কথা। বুঝলাম দুই সওয়ারি নিয়েও দ্রুত গতিতে এ-রাস্তা সে-রাস্তা পেরিয়ে রিকশা চালাতে মোটেই কষ্ট হচ্ছেনা তরুণীর।

রিকশায় গিয়ার আছে যে! আমাদের রিকশায় গিয়ার লাগানর কথা কেউ তো ভাবে না। কেন?

অনীশ গুপ্ত

১০,০০০ বছর আগের কথা বলা আছে রূপকথায়

দশ হাজার বছর ধরে মানুষ একটা গল্প বলছে। পৃথিবীর গল্প। এই গ্রহের এক অধ্যায়ের গল্প। ভাঙ্গা-গড়ার এক প্রাচীন কাহিনি। তারা নিজেরাই সে গল্প নিজেদের শোনায়। বড়রা বলে ছোটদের। ছোটরা বড় হয়ে আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে সেই কাহিনি শোনায় তাদের ছেলে-মেয়েদের। চারশ পুরুষ ধরে মুখে মুখে বয়ে চলেছে সৃষ্টির সেই জনশ্রুতি। হাজার হাজার বছর আগে তাদের দেশটা কেমন ছিল। কত দূরে ছিল সমুদ্রের নীল জল আর কোথায় ছিল মাটি। কোথায় ছিল তাদের আদি বাড়ি, কী করেই বা ডুবে গেল সব, কেমন করেই বা তাদের পূর্বপুরুষেরা খুঁজে পেল নতুন আশ্রয় – অস্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষ আজও সেই গল্প বলে। লোকমুখে ফেরে সে কথা। আধুনিক মানুষ যাকে প্রশ্রয়ের হাঁসি হেঁসে বলে, বাহ, দারুণ রূপকথা!

অতীত কথা বলে

রূপকথা, না কী ইতিহাস? ভাষাবিদ আর ভূ-বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণায় প্রমানিত যে, অস্ট্রেলিয়ার আদিম জনগোষ্ঠির ওই লোককথা আসলে তুষার যুগে পৃথিবীর সেই 'ঘন ঘন মাথা নাড়া'র দিনের এক নির্ভুল ইতিহাস। অস্ট্রেলিয়া এক বিরাট মহাদেশ। তার সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলও সুবিস্তৃত। আর সেই উপকূল ঘেঁসেই নানা জনগোষ্ঠির বাস। তাদেরই লোককথা নিয়ে ভূ-বিজ্ঞানী প্যাট্রিক নান ও ভাষাবিদ নিক রিড-এর গবেষণা, যা প্রকাশিত হয় 'অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফার'-এ। তাঁরা দেখেছেন ওই জনগোষ্ঠিগুলির রূপকথায় এক বিশেষ মিল আছে। সেগুলিতে বারে বারেই আসে সমুদ্রের কথা। মাটির কথা। বলা হয়, আজ যেখানে আছে সমুদ্র, এক সময় তা সেখানে ছিল না। ছিল আরও বহু দূরে। জলের সঙ্গে মাটির মিলন হত অনেক অনেক পথ এগোলে। সেখানেই ছিল তাদের গ্রাম। নিশ্চিন্ত জীবন। কিন্তু এক সময় ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল সমুদ্র। ডুবতে থাকল তাদের চিরকালের বাসভূমি আর তলায় তলিয়ে গেল মাটি, পাথর, গাছপালা। জলের গ্রাস থেকে বাঁচতে, পেছতে পেছতে, পেছতে পেছতে তারা সরে এল অনেক দূরে, আর তাদের সঙ্গে এল সমুদ্র। অচেনা জায়গা, কঠীন জীবন, সব কিছুই কেমন বদলে গেল। শুরু হল নতুন পথ চলা। গবেষকরা বলছেন আদিবাসীদের গল্পকথার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে ১০,০০০ বছর আগের অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের মানচিত্র। আজকে যেখানে অথৈ জল, সেখানে সে সময় ছিল ডাঙ্গাভূমি। সমুদ্র ছিল অনেক দূরে। তারপর তুষার যুগের গলে যাওয়া বরফের জলে স্ফীত হওয়া সমুদ্র ডুবিয়ে দিল উপকূলের এক বিরাট অংশ। ঠিক যেমনটা বলা আছে বংশপরম্পরায় চলে আসা আদিবাসীদের গল্পের দলিলে। দশ হাজার বছর ধরে ইতিহাসের গল্প বলছে প্রাচীন মানুষ। আধুনিক মানুষরা এই সবে তার মানে বুঝতে শিখছে।

সূত্রঃ ওয়ার্ল্ডসায়েন্স

বামন জলহস্তি অগোচরেই নিরাপদ ছিল

কখনও সে 'ওয়টার কাউ' বা জল-গরু হিসেবে পরিচিত ছিল, আবার কেউ কেউ তাকে বুনো শুয়োর বলেও ভুল করত। আসলে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকার বাইরে পিগমি হিপোপটেমাস বা বামন জলহস্তিরা মোটের ওপর অপিরিচিতই ছিল। সেখানকার প্রধানত লাইবেরিয়ার জলা জঙ্গলের বাসিন্দা এই জলহস্তিরা রাতচরা বলেই বোধহয় স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়া অন্য সকলের অগোচরেই থেকে গিয়েছিল কিছুটা। কোনও দিনই যে তারা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল তেমনটা নয়। তবে বিগত কিছু বছরের মধ্যে বসতি ধ্বংস এবং অবৈধ শিকারের কারণে এই বিরল প্রজাতির প্রাণীটি দ্রুতই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সিয়েরা লিয়োন ও গিনি তে তাদের কিছু দেখা যায়। সাধারণ জলহস্তির তুলনায় তাদের আকার প্রায় অর্ধেক। ব্যারেলের মতো লম্বা দেহে মাথাটা ছোট্ট হলেও চওড়া। তাদের কান দুটোও ছোট কিন্তু নাকটি বিশাল। উচ্চতায় প্রায় ৩ - ৩.৫ ফিট। লম্বায় হবে ৫ থেকে ৫.৭৫ ফিট আর ওজন ১৮০ থেকে ২৭৫ কেজি মত হবে। গায়ের রঙ কালচে ধূসর বা বাদামি। চিড়িয়াখানায় তাদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে

দেখা গেছে ৩০ - ৫৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে তারা।

আকারে বেশ ছোট হওয়ায় তারা জঙ্গলের ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে বেশ দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। সাধারণ জলহস্তির সঙ্গে এই বামন জলহস্তিদের আচার আচরণে কিছু তফাৎও আছে। যেমন তারা খুব কম সময়ই জলের মধ্যে কাটায়। বেশির ভাগ সময় তারা নদীর ধারে ঝোপে ঝাড়ে থাকতেই পছন্দ করে। অন্য জলহস্তির মতো তারা বড় দলে নয়, ছোট্ট দলে কিম্বা একা একাই ঘুরতেই ভালবাসে। এবং চলার পথে স্বজাতি কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে নাহ, মারপিট করে না। বরং কিছুটা অনাগ্রহ বা উদাসীনতা নিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সাধারণ জলহস্তিরা কেবল জলের মধ্যেই সন্তান প্রসব করে। কিন্তু বামন জলহস্তিরা জলে এবং ডাঙায় দু'জায়গাতেই সন্তান প্রসব করে। ডাঙায় হলে খুব গভীর জঙ্গলের মধ্যে তারা চলে যায়। এক বারে একটিই সন্তানের জন্ম দেয় তারা। তবে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হিপো ছানারা কিন্তু সাঁতার কাটতে পারে।

তৃণভোজী এই বামন জলহস্তিরা অন্যদের মতো ঘাস প্রায় খায়ই না। ফার্ণ, গাছের চওড়া পাতা, নানা ধরনের লতাপাতা এবং মাটিতে পড়ে থাকা নানা ফল পাকুড়ই তাদের প্রধান খাদ্য। রাতের বেলাতেই তারা খাদ্যের খোঁজে জঙ্গলে

বিপন্ন যারা

ঘুরে বেড়ায়। আর এই ক্রান্তীয় অরণ্য - যেখানে তাদের বসবাস, সেগুলির একদিকে কাঠ অন্যদিকে মানুষের বসতি ও চাষাবাদের চাহিদা মেটাতে রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। সঙ্কুচিত হতে থাকা তাদের বাসস্থানে তাদের বিপন্নতা ক্রমশই বাড়ছে। বাড়ছে আরও এক কারণে - তাদের মাংস লাইবেরিয়দের কাছে অত্যন্ত উপাদেয়। ফলে শিকার হচ্ছে তারা। এবং তারা শিকার হচ্ছে লেপার্ড, জলে কুমীর এমনকী পাইথনেরও।

মনে করা হয় প্রকৃতিতে সংখ্যায় তারা এখন হাজার তিনেকেরও কম আছে। এবং যে হারে অবৈধ শিকার ও অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, তাতে আর শুধু বিপন্নই নয়, অদূর ভবিষ্যতে তাদের একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সূত্রঃ এ-জেড-অ্যানিমেলস.কম, উইকিপিডিয়া

দেওয়াল লিখন

বায়ুদূষণের বিচারে ভারতের রাজধানী দিল্লি পৃথিবীর সব চেয়ে দূষিত শহর

ওয়ালর্ড ব্যাঙ্ক

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: October 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● কিছু কিছু গাছ আছে যারা কোনও পোকার দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্য গাছকেও সেই বিপদের কথা জানিয়ে সাবধান করে দেয়।

● হাঙররা বছরে হয়তো ১০ জন মানুষ মারে কিন্তু বছরে প্রায় ১০ কোটি হাঙর নিধন করে মানুষই।

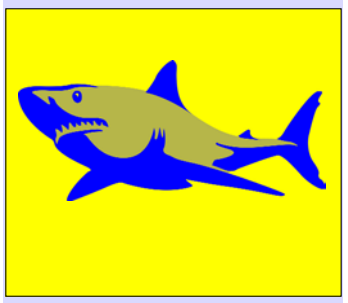

● আফ্রিকায় এক ধরনের প্রজাপতি আছে যার শরীরে এতটাই বিষ থাকে যে তাতে ৬ বিড়ালের মৃত্যু হতে পারে। কুমীর ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

●যাঁরা নানা প্রাণী পোষেন, তাদের মধ্যে ৭৯% মানুষই নিজেদের পোষ্যদের সঙ্গে ঘুমোন।

● পাখিরা কিন্তু ওড়ার সময় ল্যান্ডমার্ক বা দিকচিহ্ন চিনে রাখতে পারে। তাই বোধহয় পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার কিমি অন্যত্র পাড়ি দিলেও ওই ল্যান্ডমার্ক দেখেই পরে ঠিক ফিরে আসে।

পাখিদের অধিকার

বাঁচার অধিকার মানুষের মতোই তাদেরও মৌলিক অধিকার। এবং সে বাঁচা যেমন তেমন করে বাঁচা নয়, রীতিমতো সম্মানের সঙ্গে, স্বস্তির সঙ্গে বেঁচে থাকার, দু-ডানা মেলে আকাশে যথেচ্ছ উড়ে বেড়াবার অধিকার, হ্যাঁ আছে বইকি তাদের। আর এই কথা যে সে লোক বলছেন না। বলছেন দিল্লির মহামান্য উচ্চ আদালতের বিচারপতি মনমোহন সিংহ। তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য, জল ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি না - তা না জেনেই অবৈধভাবে যারা বিদেশে পাখি রপ্তানি করে, তাদের বিরুদ্ধেই বিচারপতি ওই ক্ষোভ প্রকাশ। তিনি আরও বলেন, "কোনও মানুষেরই কোনও অধিকার নেই ছোট্ট খাঁচায় বন্দি রেখে তাদের নিয়ে ব্যবসা করার।" দিল্লির একটি পশুপ্রেমী বেসরকারি সংস্থা কিছু খাঁচায় বন্দি পাখি উদ্ধার করে। এই নিয়ে আদালতে একটি মামলা হওয়ায় বিচারপতি এই মর্মে সম্প্রতি দিল্লি পুলিশের কাছে এবং ওই পাখির অবৈধ মালিকের কাছেও নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে এই ব্যাপারে দ্রুত তাঁদের বক্তব্য জানাতে হবে। আসলে মানবাধিকার ভঙ্গ হলে মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, আন্দোলনে নামে। উত্তরবঙ্গে ট্রেনে বাচ্চা বা সঙ্গী কেউ কাটা পড়লে হাতিরা কখনও কখনও দল বেঁধে রেল অবরোধ করে। বাঁদর বা হনুমানদেরও কোথাও কোথাও প্রতিবাদী হতে দেখা গেছে। কিন্তু প্রাণী জগতের আর কেউ সরব না হলেও অধিকার তো তাদের আছে।

সূত্রঃ দ্য স্টেট্‌সম্যান

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। আফ্রিকা সব থেকে বড় মহাদেশ নয়, কিন্তু এর থেকে বেশি সংখ্যক দেশ আর কোথাও নেই। তারা কত?
(ক) ৫৪ (খ) ৪৫ (গ) ৬২ (ঘ) ৩৯

২। এদের মধ্যে কোন নদীটি ভারত মহাসাগরে মিশেছে?
(ক) জাম্বেজি (খ) নাইল/নীল (গ) কঙ্গো (ঘ) নাইজের

৩। এই মহাদেশের নাম হয়েছে বর্তমান টিউনিশিয়ার একটি অঞ্চলের প্রাচীন গ্রিক নাম ইফরিকিয়া থেকে। শব্দটির অর্থ কি?
(ক) বিপজ্জনক জায়গা (খ) সূর্যালোকের জায়গা (গ) বিশাল জায়গা (ঘ) মরুভূমির জায়গা

৪। এদের মধ্যে কোনটি আফ্রিকাতে দেখা যায় না?
(ক) গন্ডার (খ) ভালুক (গ) বুনো কুকুর (ঘ) পেঙ্গুইন

৫। মিশর ছাড়া আর কোন দেশে পিরামিড দেখা যায়?
(ক)ঘানা (খ) আলজেরিয়া (গ) সুদান (ঘ) মালি

৬। আফ্রিকার উত্তরতম প্রান্ত থেকে দক্ষিণতম প্রান্ত কত দূর?
(ক) ১৬০০ কিমি (খ) ৩০০০ কিমি (গ) ৮০০০ কিমি (ঘ) ১৬০০০ কিমি

৭। হলিউড-বলিউড-নলিউড – আফ্রিকার কোন দেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক চলচ্চিত্র তৈরি করে বোলে এই নাম পেয়েছে?
(ক)নামিবিয়া (খ) কেনিয়া, যার রাজধানী নাইরোবি (গ) মিশর যার আর এক নাম নীল নদের দান (ঘ) নাইজেরিয়া

৮। আফ্রিকার সব দেশের সম্মিলিত সংগঠন আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রধান অফিসের বাড়ি চিনারা বানিয়ে দিয়েছে কোন শহরে?
(ক) কায়রো (খ) প্রিটোরিয়া (গ) কম্পালা (ঘ) আদিস আবাবা

৯। আফ্রিকার কোন দেশে আনুপাতিক হিসেবে পৃথিবীর সব থেকে বেশি মহিলা সাংসদ আছেন?
(ক) সাউথ আফ্রিকা (খ) রওয়ানডা (গ) উগান্ডা (ঘ) সেনেগাল

১০। লাইবেরিয়ার রাজধানী মনোরোভিয়া কার বা কিসের নামে?
(ক) উনবিংশ শতাব্দীর এক আমেরিকান রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো (খ) চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো (গ) ওই অঞ্চলের গাছ মনরো (ঘ) প্রাচীন মনরো সাম্রাজ্য।

উত্তরঃ ১/ ক; ২/ক; ৩/খ; ৪/খ; ৫/গ বস্তুত সুদানে মিশরের থেকে বেশি কঙ্কাল আছে; ৬/গ; ৭/ঘ; ৮/ঘ; ৯/খ, রওয়ান্ডার বিধানসভার সদস্যদের ৬৪% মহিলা, পৃথিবীর আর কোথাও মহিলা সাংসদদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি নেই ১০/ক

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com